সাহিত্য পত্রিকা ॥ বর্ষ : ৫৫ ॥ সংখ্যা : ৩ ॥ জুন ২০১৮

আল মাহমুদের *উপমহাদেশ* : মুক্তিযুদ্ধাশ্রয়ী আত্মজৈবনিক শিল্পভাষ্য

মো. জসিম উদ্দিন*

সারসংক্ষেপ : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য নাম আল মাহমুদ (১৯৩৬ – ২০১৯)। বিশ শতকের পঞ্চাশের দশকে বাংলাদেশের সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে প্রতিশ্রুতিশীল একজন কবি হিসেবে এবং তিনি নির্মাণ করেছেন স্বকীয় এক কাব্যভুবন। তাঁর কাব্যযাত্রা নগরজীবনের ক্ষয়, ধ্বংস ও নিঃসঙ্গতার চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে শুরু হলেও বারবার তিনি ফিরে গেছেন ঐতিহ্য-সংলগ্নতায় ঋদ্ধ বাংলার গ্রামীণ লোকজীবনে; করেছেন শিকড়-সন্ধান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পূর্ববর্তী সময়কালে কবিতাই ছিল তাঁর সাহিত্য-অন্বিষ্ট। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে কবিতার পাশাপাশি তিনি প্রবেশ করেন বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে। *সোনালী কাবিনের* (১৯৭৩) কবি হিসেবে খ্যাত আল মাহমুদ কথাসাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন ছোটগল্প রচনার মাধ্যমে। কবিতা ও ছোটগল্পে যেমন, ঠিক তেমনি উপন্যাসেও তিনি প্রদর্শন করেছেন ঈর্ষণীয় সাফল্য। মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত *উপমহাদেশ* (১৯৯৩) উপন্যাসটি বাংলা কথাসাহিত্যে তাঁর এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

এক.

আল মাহমুদ প্রধানত কবি। বাংলাদেশের কবিতাভুবনে তাঁর অবস্থান স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত হলেও স্বল্পপরিসর কথাসাহিত্যেও তাঁর অবস্থান মর্যাদামণ্ডিত। কবিতার পাশাপাশি তিনি লিখেছেন অসংখ্য কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ। বাঙালির সহস্র বছরের ঐতিহ্যকে তিনি ধারণ করেছেন একটি লোকধর্মকেন্দ্রিক বৃহৎ সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষায়। তাঁর সেই আকাঙ্ক্ষায় এসে মিশেছে সাম্যবাদী যুবক, কিংবা কর্মজীবী গ্রামীণ কৃষক-শ্রমিক। বাংলার গ্রামীণ লোকজীবন-লোকাচার ও লোকভাষ্যের সমন্বিত এই প্রয়াস একমাত্র আল মাহমুদের রচনাতেই প্রত্যক্ষ করা যায়। পাশাপাশি নারী-পুরুষের সম্পর্ক, সম্পর্কের রহস্যময়তা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জীবন ও জীবিকার সাযুজ্য, নারীদেহের সৌন্দর্য, ফ্রয়েডীয় লিবিডোচেতনা প্রভৃতি অবলম্বন করে তিনি রচনা করেছেন তাঁর সাহিত্যকর্ম। কবিতার পাশাপাশি গদ্যেও তিনি প্রদর্শন করেছেন

---

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০

https://doi.org/10.62328/sp.v55i3.8

লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র্য। কবি জসীমউদ্‌দীন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছিলেন আল মাহমুদের গদ্যের। কবি জসীমউদ্‌দীনকে লিখিত আল মাহমুদের এক পত্রে পাওয়া যায় এই তথ্য :

> আমার গদ্য আপনার ভালো লেগেছে জেনে খুশি হয়েছি। এদিকটা প্রসারিত করার জন্য আপনার উপদেশ আমাকে দারুণভাবে প্রাণিত করেছে। আমারও বিশ্বাস, আমরা যারা শুধু কবিতা নিয়ে আছি তারা অল্পাধিক গদ্য রচনা করলে এ দেশে গদ্য সাহিত্যের এমন দুর্গতি হতো না। অন্তত প্রত্যেক কবি একটি বা দুটি উপন্যাস অথবা প্রবন্ধ বই রচনা করলে আমাদের সাহিত্যের চেহারা পাল্টে যেত। (ওমর, ২০০১ : ২৪৬)

পত্রটি আল মাহমুদ লিখেছিলেন ১৯৬৭ সালে, যখন সবেমাত্র বাংলা কথাসাহিত্যজগতে হাতেখড়ি হয়েছে তাঁর। সে-সময় তাঁর কেবলই একটি বা দুটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছে দৈনিক পত্রিকার সাহিত্যের পাতায়। চিঠিতে প্রকাশিত বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই বুঝি পরবর্তীকালে তিনি বিচরণ করেছেন সাহিত্যের প্রায় সমস্ত আঙ্গিকে। *সোনালী কাবিন* প্রকাশের কিছুকাল পরেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *পানকৌড়ির রক্ত* (১৯৭৫)। গ্রন্থটি প্রকাশের পরপরই বাংলাদেশের সচেতন পাঠকমহলে আলোড়ন জাগাতে সক্ষম হন তিনি। পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে – *সৌরভের কাছে পরাজিত* (১৯৮২), *গন্ধবণিক* (১৯৮৮), *ময়ূরীর মুখ* (১৯৯৪), *নদীর সতীন* (২০০৪), *ছোট-বড়* (২০০৫) প্রভৃতি গল্পগ্রন্থ। আল মাহমুদের ছোটগল্প সম্পর্কে প্রখ্যাত কথাশিল্পী আবু রুশদের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> বাংলাদেশে আল মাহমুদের সমতুল্য অন্য কোনো কবির হাত থেকে এত কয়টা ভালো গল্প বেরিয়েছে বলে আমার জানা নেই। এটা তাঁর সাহিত্যিক গুরুত্বে ঈর্ষনীয় মাত্রা যোগ করবে বলে আমার বিশ্বাস। (রুশদ, ২০০৭ : ১৫০)

এই বিশ্বাস যে অতিরঞ্জিত নয় তা আল মাহমুদের গল্পপাঠ করলে স্পষ্টই অনুধাবন করা যায়।

ঔপন্যাসিক হিসেবে আল মাহমুদের আবির্ভাব ঘটে আশির দশকে। *যেভাবে বেড়ে উঠি* (১৯৮৬) তাঁর প্রথম আত্মজৈবনিক রচনা, যেটি রচিত হয় উপন্যাসের আঙ্গিকে। অতঃপর তিনি রচনা করেন *ডাহুকী* (১৯৯২), *উপমহাদেশ* (১৯৯৩), *কাবিলের বোন* (১৯৯৩), *পুরুষ সুন্দর* (১৯৯৪), *নিষিন্দা নারী* (১৯৯৫), *আগুনের মেয়ে* (১৯৯৫), *পুত্র* (২০০০) প্রভৃতি উপন্যাস। আল মাহমুদের প্রতিটি উপন্যাসেই নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে মাটি ও মানুষের আখ্যান, সমাজ ও রাষ্ট্রের চালচিত্র, প্রেম ও রিরংসাবৃত্তি এবং অবশ্যই নারীর শরীরী সৌন্দর্যের বিবরণ।

দুই.

মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দীর্ঘ নয়মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম যেমন আমাদের জীবন, সমাজ ও রাজনীতিতে রেখেছে গুরুত্বপূর্ণ

আঁচড়, তেমনি সাহিত্যেও মুক্তিযুদ্ধের প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী। মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে যুদ্ধকালীন সময় থেকে শুরু করে বর্তমানেও রচিত হচ্ছে কবিতা, উপন্যাস, নাটক, ছোটগল্প প্রভৃতি। তবে বাংলাদেশের সাহিত্যের কোনো শাখাতেই মুক্তিযুদ্ধের সামগ্রিক চিত্র ও আবেদন পূর্ণাঙ্গভাবে আসেনি। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে অকুতোভয় বাঙালি জাতির রক্তাক্ত সংগ্রাম, আত্মত্যাগ ও জয়লাভের মাধ্যমে আমাদের মন ও মননে জাগ্রত হয়েছে যে নতুন চেতনা, তার প্রতিফলন একান্তভাবেই প্রত্যাশিত ছিল উপন্যাসে। কিন্তু বাংলাদেশের সাহিত্যে এখনও এমন কোনো উপন্যাস রচিত হয়নি, যেখানে মহান এই যুদ্ধের সামগ্রিক চিত্র ও আত্মত্যাগের মহিমা ভাস্বর হয়েছে। আমাদের অধিকাংশ ঔপন্যাসিক যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং জাতীয় হতাশার শব্দচিত্র অঙ্কনেই হলেন অধিক আগ্রহী; দ্রোহ-বিদ্রোহ-প্রতিবাদ-প্রতিরোধ আর উত্তরণের কথাচিত্র নির্মাণে তারা মোটেই উৎসাহী নন। এ কারণেই নঞর্থক জীবন ভাবনায় বিশ্বাসী কতিপয় ঔপন্যাসিক মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক উপন্যাস নির্মাণ করতে গিয়েও ব্যবসায়িক মনোবৃত্তিকে কেবল চিত্রিত করেন পাকিস্তানি ঘাতক সৈন্য-কর্তৃক নারী–ধর্ষণের অনুপুঙ্খ বিবরণ। যুদ্ধোত্তর সময়ে মূল্যবোধের অবক্ষয়, সর্বব্যাপী হতাশা, নৈরাজ্য এবং অর্থনৈতিক বিপর্যয় কাটিয়ে মহৎ শিল্পিমানস অনুসন্ধান করে জীবন ও শিল্পের জন্য সদর্থক এবং আলোকোজ্জ্বল এক মানসভূমি; কোনো কোনো ঔপন্যাসিকের রচনায় এ জাতীয় অভিজ্ঞান মুক্তিযুদ্ধের উপন্যাসসাহিত্যের আশাব্যঞ্জক দিক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে যাঁরা উপন্যাস রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শওকত ওসমান, সৈয়দ শামসুল হক, রশীদ হায়দার, আল মাহমুদ, সেলিনা হোসেন, হুমায়ূন আহমেদ, মঞ্জু সরকার, মঈনুল আহসান সাবের, ইমদাদুল হক মিলন প্রমুখ। মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাকে আশ্রয় করে আল মাহমুদ মাত্র দুইটি উপন্যাস লিখলেও উভয় উপন্যাসেই তিনি যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী সময়ের হতাশা-নৈরাজ্য, অবক্ষয়ের চিত্র যেমন তুলে ধরেছেন; পাশাপাশি প্রত্যাশা করেছেন একটি স্বাধীন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশের।

মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে আল মাহমুদের সর্বাধিক আলোচিত ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *উপমহাদেশ*। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও কথক সৈয়দ হাদী মীর যেন ঔপন্যাসিকের আত্ম-প্রতিকৃতি। ঔপন্যাসিক এখানে যেমন আত্মজৈবনিক বিষয়ের অবতারণা করেছেন ঠিক তেমনি আমাদের জাতীয় জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেকগুলি চরিত্রের বাস্তবতাসম্পৃক্ত বিষয়াবলিও উপস্থাপন করেছেন; যা উপন্যাসটিকে অনেকটা বাস্তবানুগ হতে সাহায্য করেছে। উপন্যাসটি সম্পর্কে আল মাহমুদ নিজেই বলেন :

> *উপমহাদেশ* মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আমার প্রথম বড় রচনা। এ দেশের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে এই বইটির মৌলিক পার্থক্য আছে। যারা মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে সরাসরি

> জড়িত ছিলেন না কিম্বা মুক্তিযুদ্ধের সংঘাত, সংঘর্ষ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেননি তারাও মুক্তিযুদ্ধের ওপর সার্থক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাদের রচনার সার্থকতা নিয়ে আমি কোনদিনই সমালোচনামুখর ছিলাম না। এখনও নই। তবে *উপমহাদেশ* বইটির সবটাই বানানো নয়। এতে কল্পকাহিনী আছে বটে তবে প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতাও আছে। এ বইটির সার্থকতা এখানে। (আল মাহমুদ, ২০১৮ : ভূমিকা)

ঔপন্যাসিক নিজেই স্বীকার করেছেন উপন্যাসটিতে বাস্তব ঘটনা যেমন আছে, তেমনি কল্পকাহিনিও আছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আল মাহমুদের সক্রিয়তা নিয়ে অনেক সমালোচনা আছে, তারপরও তাঁর অনেক শুভাকাঙ্ক্ষী মুক্তিযুদ্ধের সময়খণ্ডে তাঁর ভূমিকাকে 'সামান্য' বলতে নারাজ। মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী সময়ে তিনি কর্মরত ছিলেন দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক পদে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে আল মাহমুদ চলে যান ভারতে। মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে তিনি কাজ করেছেন কলকাতায় স্থাপিত প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য বিভাগে। মুক্তিযুদ্ধে তিনি সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন এ-ধরনের কোনো তথ্য জানা যায় না। তাঁর সমালোচকদের মতে, প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে থাকলেও মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অবদান সামান্যই। কলকাতা অবস্থানকালীন সময়ে তিনি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে সময় পার করেছেন। কিন্তু কবির মতে, তিনি ভারত-বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন, আড্ডা দিতেন মূলত তাঁরা যেন বাংলাদেশে পক্ষে লেখালেখি করেন এবং এটাই ছিলো তাঁর দায়িত্ব। যাই হোক, আল মাহমুদকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের একজন সম্মুখযোদ্ধা না বলে 'কলম সৈনিক' হিসেবে অভিহিত করাই বেশি যুক্তিযুক্ত।

তিন.

উপমহাদেশ উপন্যাসের প্রধান চরিত্র ও কথক সৈয়দ হাদী মীর তৎকালীন পাকিস্তান আর্টস কাউন্সিলের লাইব্রেরিয়ান। তিনি একজন কবি এবং বয়স পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি। বলা যায়, চরিত্রটি ঔপন্যাসিকের নিজেরই আত্ম-প্রতিকৃতি। সৈয়দ হাদী মীর একজন সরকারি চাকুরে, আর বাস্তব জীবনে ঔপন্যাসিক ছিলেন পত্রিকার সাংবাদিক। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের কালোরাতে ঢাকাসহ সারাদেশে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যে তাণ্ডব চালায়, তা থেকে বাঁচতে মানুষ দলে দলে ভারতে আশ্রয় নেয়। পাকিস্তানি বাহিনীর আক্রমণের কিছুদিন পরে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে সেই সরকারের একজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা গল্পকথক সৈয়দ হাদী মীরের ভগ্নিপতি হোসেন তৌফিক ইমাম একজন মুক্তিযোদ্ধাকে পাঠান হাদী মীরকে বাংলাদেশ থেকে ভারতের আগরতলায় নিয়ে যাওয়ার জন্য। প্রায় ত্রিশজন যাত্রীসহ হাদী মীরকে নিয়ে মুক্তিযোদ্ধা আনিস ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ভৈরব বাজারের নারায়ণপুর থেকে নৌকাসহযোগে ভারত সীমান্তের দিকে যাত্রা শুরু করেন। যাত্রামুহূর্তে ভৈরবের

শিক্ষিকা সীমা ও তার তরুণী বোন নন্দিনীর কাকুতি মিনতিতে রাজি হন তাদেরকেও সাথে নিতে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গন্তব্যের কাছাকাছি এসে তারা ধরা পড়েন সিরাজ শিকদারের সর্বহারা পার্টির অস্ত্রধারী বাহিনীর সামনে; যারা চায় না বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহযোগিতা করুক। তাই পলায়নপর সৈয়দ হাদী মীরের দলের উদ্দেশ্যে তাদের উক্তি :

> 'তোমরা হারামির বাচ্চা। ভারতের দালাল। দেশটাকে হিন্দুদের কাছে বেচে দিতে যাচ্ছো। সবকয়টাকে কুত্তার মত গুলী করে মারবো। যাও, সবগুলো একঠাঁই জমা হয়ে দাঁড়াও।' (*উপমহাদেশ*, পৃ. ১৫)

তাদের এই আস্ফালন অবশ্য বাস্তবতায় রূপ নেয়নি। সর্বহারা পার্টির সদস্যদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে হাদী মীর তার সঙ্গীদের সঙ্গে অগ্রসর হয় ভারতীয় সীমান্তের দিকে। সর্বহারা পার্টির সদস্যদের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় মুক্তিযুদ্ধ শুরুর প্রথমদিকে তারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিলো। তাদের অভিপ্রায় ছিল : 'পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন করবো আমরা'। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসসূত্রে জানা যায়, তৎকালীন কট্টর চীন-সমর্থক কমিউনিস্ট, মাও-লেনিনপন্থী কমিউনিস্ট আন্দোলনকারী নকশালরাও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে নিয়মিত প্রচার চালানো হতো পিকিং রেডিও থেকে। নকশালরা যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করেছিল, এ-সংক্রান্ত খবর বিশ্বখ্যাত 'টাইম' পত্রিকায় ২৪ শে এপ্রিল ১৯৭১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে প্রতিবেশী দেশ ভারত প্রথম থেকেই প্রবাসী সরকার গঠন, তাদের কর্মপ্রণালি নির্ধারণ, অস্ত্র ও ট্রেনিং দিয়ে সহায়তা করছিল। বিষয়টি আওয়ামীলীগ ও তার সমমনা দলগুলো ছাড়া অন্য দলগুলো মেনে নিতে পারেনি। বিশেষ করে বামপন্থী ভাবাদর্শে বিশ্বাসী এবং নকশালপন্থী দলগুলো মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তার বিরোধী ছিল। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তাকে তারা ভিন্ন চোখে দেখতো এবং এজন্য তারা আলাদাভাবে নিজেরা প্রশিক্ষণ শিবির তৈরি করে সেখানে প্রশিক্ষণ নিয়ে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে আলাদাভাবে যুদ্ধ করেছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তারা হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সশস্ত্র লড়াই করেছে, এক্ষেত্রে বাম ঘরানার রাজনৈতিক দলগুলোর অবদান কোনোভাবেই কম নয়। তবে ভারত সরকারও চেয়েছিল- বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে জয়লাভের কৃতিত্ব আওয়ামীলীগ ছাড়া অন্য কোন দলের হাতে যাতে না যায়। তাই তারা যুদ্ধে আওয়ামীলীগ ও তার সমর্থক ব্যতীত অন্য কাউকে সেই অর্থে সাহায্য-সহযোগিতা করেনি। *উপমহাদেশ* উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তেমনি একটি বাম-ঘরানার রাজনৈতিক দলের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের চিত্র তুলে ধরেছেন। কমরেড তোহার নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী দলের একটি অংশের

নেতা কমরেড আলী রেজার মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ কাহিনি উপন্যাসে রয়েছে। এই দলের কমরেড আদিনাথ মজুমদারের ভাষ্যে পাওয়া যায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তাদের ভাবনা :

> ইন্দিরা গান্ধি চাইছেন না মুক্তিযুদ্ধটা আওয়ামীলীগের হাত থেকে ফসকে দেশের ভেতরকার মার্কসবাদী বিপ্লবী গ্রুপগুলোর হাতে চলে যাক। (*উপমহাদেশ*, পৃ. ১৪৪)

আসলে ভারতের এই চিন্তার পেছনে তাদের নিজেদের স্বার্থও জড়িত ছিল। কারণ 'ভারত চায় না বাংলাদেশের মাটিকে চীনপন্থীদের গেরিলা তৎপরতার উর্বর ক্ষেত্র বানাতে।' কারণ এতে ভারতের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নও জড়িত। ভারতের অনেক রাজ্যেই তখন মার্কসবাদী-নকশালপন্থী গোষ্ঠীর দৌরাত্ম্য বেড়ে গিয়েছিল। তাই তারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বামঘরানার রাজনৈতিক দলগুলোকে ততোটা সহায়তা করেনি। কারণ :

> 'ভারত ভাবছে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে এভাবে প্রতিরোধ চালিয়ে গেলে তাদের আসামে-মেঘালয়ে – এমন কী পশ্চিমবঙ্গেও এ যুদ্ধ ছড়িয়ে যাবে। পরিণামে ভারতের সমগ্র পূর্বাঞ্চলে নকশালপন্থীরা প্রভাব বিস্তার করবে। আর পরাজিত পাকিস্তানিরা তাদের সমস্ত আর্মস এম্যুনেশন তুলে দেবে নকশালদের হাতে। তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধ পরিণত হবে পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের লড়াইয়ে। ভারত এটা হতে দেবে কেন ?' (*উপমহাদেশ*, পৃ. ১৭৬)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এরকম বাস্তব ও অসংখ্য সত্য ঘটনার বিবরণ ও তথ্যে ভরপুর উপন্যাসটি। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী রাজাকার, আল শামস, আলবদর বাহিনী এসময় কতোটা হিংস্রতা চালিয়েছে সাধারণ মানুষের উপর, তার বিবরণও পাওয়া যায় উপন্যাসে। প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জনের যে দলটির সঙ্গে কবি সৈয়দ হাদী মীর পালিয়ে যাচ্ছিল ভারতীয় বর্ডারের দিকে, সেই দলটি সিরাজ শিকদারের সর্বহারা বাহিনীর হাত থেকে বাঁচলেও একটু এগিয়েই ধরা পড়ে রাজাকার বাহিনীর হাতে। রাজাকাররা অসহায় মানুষগুলোর সর্বস্ব লুটে নেয় । তারপর সীমা, নন্দিনী ও কবি হাদী মীর ব্যতীত সবাইকে ছেড়ে দেয়। সীমা ও নন্দিনীকে সারারাত ধরে ধর্ষণ করে হানাদাররা। এই অমানবিক ও পাশবিক কর্মকাণ্ডের বিবরণ পাওয়া যায় কথক হাদী মীরের বয়ানে :

> নন্দিনী চুপচাপ উদাস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বসে আছে। তার পরনে শুধু সায়া। শরীরে ব্লাউজ বা ব্রেসিয়ার কিছু নেই। পিঠও নগ্ন এবং পাশবিক অত্যাচারের চিহ্নে ক্ষত বিক্ষত। আমাকে কতক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে দেখেই সে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলল। আমি কোনো মতে টেনেহিঁচড়ে নন্দিনীর কাছে গিয়ে তার হাত ধরতেই সে দুহাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে জোরে বিলাপ করে কেঁদে উঠল। আমার মুখ থেকে কোন কথা বেরুল না। আমি বারান্দায় পড়ে থাকা রক্তে ভেজা নোংরা শাড়িটাই টেনে এনে তার শরীরের ওপর মেলে দিলাম। (*উপমহাদেশ*, পৃ. ৩২)

নন্দিনী ও সীমার মতো এ রকম লক্ষ লক্ষ নারী সম্ভ্রম হারিয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে। উপন্যাসের অন্য অংশে দেখা যায় কমরেড আলী রেজার নেতৃত্বাধীন সাম্যবাদী দলের আরেক নারী কমরেড নাসরিনের উপর শারীরিক নির্যাতনের চিত্র। তার অপরাধ সে মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দলকে সহায়তা করেছে। এজন্য তাকে তার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে সারারাত ধরে অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনি।

চার.

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত-বাংলাদেশের সর্বস্তরের মানুষ সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেও বাংলাদেশের কিছু মানুষ যেমন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, ঠিক তেমনি ভারতের জনগণের একাংশও মুক্তিযুদ্ধকে মেনে নিতে পারেনি। কলকাতায় পৌঁছে হাদী মীর ও নন্দিনী একটি দোকান থেকে পান কিনতে গেলে দোকানদার তাদের পরিচয় পেয়ে বলে –

> "সামনের দোকান থেকে পান নিন। আমি আপনাদের কাছে পান বেচব না। আপনারা পাকিস্তান ভেঙে দেয়ার জন্য হিন্দুস্তানে গাদ্দারি করতে এসেছেন। আমরা হিন্দুস্তানি মুসলমানরা আপনাদের ঘৃণা করি। যান আগে বাড়েন।" (*উপমহাদেশ*, পৃ. ৭৭)

আসলে ভারতের বেশিরভাগ মুসলমান, বিশেষ করে বিহারী সম্প্রদায়ের মানুষ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের এই যুদ্ধকে মেনে নিতে পারেনি। তারা ছিলো বঞ্চিত মুসলমান, পাকিস্তান ছিল তাদের স্বপ্ন। এই স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে দেখে তারা তা কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। এ-সম্পর্কে একজন সমালোচকের বক্তব্য :

> এই যুদ্ধের প্রতি ভারতের সাধারণ মানুষদের মনোভাব ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা শরণার্থীদের সাহায্য করেছিলেন মুক্ত হাতে। বাড়িতে থাকতে দিয়েছিলেন; খেতে দিয়েছিলেন।...যাঁদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাওয়া যায়নি, তাঁরা হলেন বিহারী এবং পশ্চিম বাংলার বেশির ভাগ মুসলমান। পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ায় তাঁরা দুঃখ পেয়েছিলেন। (মুরশিদ, ২০১৬ : ১১০)

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের এই মনোভাবের অনেক কারণ রয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিরা যেভাবে দিনের পর দিন পাকিস্তানি শাসকদের হাতে নিপীড়িত-নিগৃহীত হয়েছে, তেমনি ভারতেও সংখ্যালঘু মুসলমানরা বিভিন্ন সময়ে শাসকগোষ্ঠীর নিপীড়নের শিকার হয়েছে। তাই পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আলাদা এক ধরনের আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে, তা তারা তখন পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারেনি। ভারতের মুসলমানদের এই

ঘৃণার মনোভাব দেখে নন্দিনীর মনে হয়েছে : 'এমন ঘৃণা আর অপছন্দ নিয়ে ইন্ডিয়ার সংখ্যালঘু বিশ পঁচিশ কোটি মুসলমান বাস করে এদেশে? তাহলে তো ভারতও একদিন ভেঙে টুকরো হয়ে যাবে।' (*উপমহাদেশ*, পৃ. ৭৮)

উপমহাদেশ উপন্যাসে কবি হাদী মীর ও নন্দিনীর জীবনের নানা ঘটনা-পরিক্রমার সঙ্গে যুক্ত করে ঔপন্যাসিক বাস্তব জীবনের অনেক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে। উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হোসেন তৌফিক ইমাম। যিনি হাদী মীরের ভগ্নিপতি। যুদ্ধ শুরুর পূর্বে তিনি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের গুরুত্বপূর্ণ একজন আমলা ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি কলকাতাস্থ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সচিব পদে দায়িত্ব পালন করেন। বাস্তব জীবনেও তিনি ঔপন্যাসিকের একজন আত্মীয়। উপন্যাসে এই চরিত্রটির ভূমিকা কোনো অংশে কম নয়। হাদী মীর ও নন্দিনী বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে পৌঁছে আশ্রয় পায় তার ভগ্নিপতি হোসেন তৌফিক ইমামের বাসায়। পরবর্তীকালে তিনি হাদী মীরকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য বিভাগের কর্মকর্তা পদে নিয়োগ দেন। তাঁর দায়িত্ব ছিলো ভারতে অবস্থানরত বাংলাদেশের কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সংস্কৃতিকর্মীসহ ভারতের বাংলা ভাষার কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা। তাঁদেরকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত করা এবং তাঁরা যেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভূমিকা রাখেন, লেখালেখি করেন সে বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা। হোসেন তৌফিক ইমাম ছাড়া মেজর খালেদ মোশাররফ, দিনাজপুরের কমরেড আদিনাথ মজুমদার, তাঁর স্ত্রী কমরেড সবিতা মজুমদার, কমরেড আলী রেজা প্রভৃতি চরিত্রের স্বল্পকালীন উপস্থিতি উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহকে আরও বাস্তবসম্মত করছে। মেজর খালেদ মোশাররফের সঙ্গে কবি হাদী মীরের সাক্ষাৎ হলে তাকে বলা খালেদ মোশাররফের যে বক্তব্য তা সত্যিই চমকজাগানিয়া। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিকের যুদ্ধকৌশলের সঙ্গে তিনি তুলনা করেছেন কবির কবিতা-লিখন কৌশলের :

> 'কবি সাহেব, সামনা সামনি যুদ্ধটাও কিন্তু কবিতার আকস্মিক শব্দ পেয়ে যাওয়ার মতোই ব্যাপার। আপনারা যখন লেখেন তখন যেমন জানেন না মিলটা কোন শব্দ দিয়ে ঘটবে। তেমনি প্রকৃত সোলজারও জানে না স্যাডেন কোন কৌশলে শত্রুরা ধরাশায়ী হবে। শুধু গুলী চালানটা ভালো করে শিখতে পারলেই আত্মরক্ষার কৌশলটাও তার খানিকটা জানা যায়। শত্রুর মুখোমুখি হলে কোনো দক্ষতা বা পূর্ব অভিজ্ঞতার চিত্র সৈনিকদের মনে থাকে না। ফায়ারিংয়ের সামনে দাঁড়ালে অদৃষ্টপূর্ব আত্মরক্ষার অভিজ্ঞতা এসে সৈনিককে সাহায্য করে। যেমন আপনারা না হাতড়েই মিলের উপযুক্ত শব্দটা হঠাৎ পেয়ে যান।' (*উপমহাদেশ*, পৃ. ৫১)

উপন্যাসে বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন কবি-সাহিত্যিকের উপস্থিতিও লক্ষ্যণীয়। শক্তি চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪–১৯৯৫), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৩৪–২০১২),

গৌরকিশোর ঘোষ (১৯২৩–২০০০), নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯২৪–২০১৮), বেলাল মোহাম্মদ (১৯৩৬–২০১৩) প্রমুখ সাহিত্যিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ হয়েছে কবি হাদী মীরের। কলকাতার কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে কবি হাদী মীরের পূর্বে কখনো দেখা-সাক্ষাৎ না হলেও তাঁদের মধ্যে পত্রালাপ ছিল; কবি হাদী মীর সম্পর্কে তাঁরা জানতেন। তাই মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে কবি হাদী মীর যখন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে যান কলকাতার আনন্দবাজারের অফিসে, তাঁরা তাঁকে গ্রহণ করেছেন উষ্ণ আতিথেয়তায়। হাদী মীরকে কাছে পেয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উচ্ছ্বাসময় অভিব্যক্তি অন্তত তারই প্রমাণ :

> আরে হাদী, তোমার কবিতা আমার যা ভালো লাগে না! ওসব কী মুখে বলে কোনো কবিকে বোঝানো যায় ? বল ভাই, কীভাবে এলে? আসতে কোনো কষ্ট পাও নি তো? আমাকে তুমি বলে ডাকো। তোমার বন্ধুত্ব চাই হাদী। তোমার আত্মীয়তা চাই। (*উপমহাদেশ*, পৃ. ৮৯)

এ কথা সত্যি যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী কবি-সাহিত্যিকদের সমর্থন নানাভাবেই অনুপ্রণিত করেছে মুক্তিযুদ্ধকে। নয় মাসের রক্ষপ্লাবী সংগ্রামের সময়কালে অনেকেই সেদিনের বাঙালিদের দুঃখ-দুর্দশা ও পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অত্যাচার-নিপীড়নের কথা জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পত্র-পত্রিকায় লিখে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। *উপমহাদেশ* উপন্যাসে কলকাতার কবি-সাহিত্যিকদের উপস্থিত করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের অবদানকে স্মরণ করেছেন ঔপন্যাসিক।

উপমহাদেশ উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ একটি চরিত্র কবি হাদী মীরের স্ত্রী মুক্তিযোদ্ধা মীর হামিদা বানু বেগম। হাদী মীর কলকাতায় অবস্থান করে কবি সাহিত্যিকদের সংগঠিত করার দায়িত্ব পালন করলেও তার স্ত্রী রণাঙ্গনের একজন মুক্তিযোদ্ধা, যিনি পাকিস্তানি বাহিনীর বাংলাদেশ আক্রমণের অব্যবহিত পরেই ভারতে পালিয়ে গিয়ে যোগ দেন মুক্তি বাহিনীতে এবং রণাঙ্গনে বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে হামিদা বানু জানতে পারেন তার স্বামীর বর্তমান অবস্থান সম্পর্কে। তাই তিনি বাংলাদেশের ভূখণ্ডে একটি বড় অপারেশনে যাওয়ার পূর্বে সাক্ষাৎ করতে আসেন স্বামী হাদী মীরের সঙ্গে। স্বামী হাদী মীরকে উদ্দেশ্য করে এ সময় তিনি যে উক্তি করেছেন, তা যেন মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রতিটি যুদ্ধক্ষেত্র বা যুদ্ধক্ষেত্রের বাইরে যেসকল নারী বীরত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাদের সকলেরই জীবনভাষ্য :

> "আমি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে একটা বাহিনীর সাথে জড়িত। এর মধ্যে আমি শপথ গ্রহণ করেছি যে পর্যন্ত বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে হানাদার মুক্ত না হবে ততক্ষণ আমি আমার জান প্রাণ ইজ্জত দিয়ে হলেও শত্রুর বিরদ্ধে লড়াই করে যাব। প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে এই লড়াই চলবে। অস্ত্রে, কৌশলে, সত্যে এবং প্রয়োজনবোধে মিথ্যেয় ক্রমাগত এদের আক্রমণ করে যাব। দেশমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কোনো সাংসরিক বন্ধন বা ব্যক্তিগত সম্পর্কে ফিরে যাব না।" (*উপমহাদেশ*, পৃ. ৯৬)

নন্দিনী, সীমা যেমন মুক্তিযুদ্ধকালে ধর্ষিত-নির্যাতিত নারীর প্রতিচ্ছবি, তেমনি বাংলার সকল নারী; বিশেষ করে, যারা মুক্তিযুদ্ধে ঘরে বসে না থেকে রণক্ষেত্রে অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধ করেছে, ঘরে থেকে মুক্তিবাহিনীকে নানাভাবে সাহায্য করেছে, মুক্তিযোদ্ধাদের হাসপাতালের ক্যাম্পে আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করেছে; তাদের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে হামিদা চরিত্র। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখ-সমরে হামিদার মতো এ-ধরনের নারীর অংশগ্রহণ কম হলেও একেবারেই যে নেই তা নয়। খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি তাদেরই একজন। হামিদা চরিত্রটিকে ঔপন্যাসিক যেন তারামন বিবিদের প্রতীক হিসেবেই এ-উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন।

পাঁচ.

মুক্তিযুদ্ধকে আশ্রয় করে *উপমহাদেশ* রচিত হলেও, যুদ্ধকালীন হতাশা-অবিশ্বাস ও সংকটময় মুহূর্তের বাস্তব বর্ণনার পাশাপাশি দুজন নারীর সঙ্গে কবি হাদী মীরের প্রেম-ভালোবাসা ও নবসম্পর্কের এক রহস্যঘন জমজমাট উপস্থাপনা রচনাটিকে ভিন্নমাত্রায় উদ্ভাসিত করেছে। আল মাহমুদের রচনা তথা কবিতা, ছোটগল্প ও উপন্যাসে নারীর উপস্থিতি তথা নারীদেহের সৌন্দর্যের চমক স্বাভাবিক ঘটনা। সমালোচকের মতে :

> ফ্রয়েডিয় যৌন চেতনাকে উপন্যাসে আল মাহমুদ দিয়েছেন শিল্পরূপ। তাঁর জীবনে নারী ও প্রকৃতি দুটি প্রিয় প্রসঙ্গ, একে অন্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। প্রকৃতির খুঁটিনাটি যেমন সমান আগ্রহে তুলে ধরেছেন তাঁর লেখায়, তেমনি নারীর প্রতি আগ্রহ সমতুল্য। অকপটে বলেছেন,'...আমার কাছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হলো নারী।' কবিতায় যেমন লিখেছেন,
>
> নারীর দেহের চেয়ে নম্য কিছু নেই পৃথিবীতে
> সব শাস্ত্র ঘেঁটে শেষে হে জ্যোতিষি নারীতে আরাম,
> রোহিণী তারার ওম একমাত্র নারী পারে দিতে
> মাতাবধুকন্যা কহ, নারী এক রহস্যের নাম
> (শিবানন্দ, ২০১৯ : ৬৪)

উপন্যাসের প্রারম্ভেই নন্দিনীর দৈহিক বর্ণনায় সমালোচকের উক্তির সত্যতা স্পষ্ট। সাক্ষাতের সূচনাপর্বেই নন্দিনী সম্পর্কে কবি হাদী মীরের উক্তি লক্ষ্যণীয় :

> দেখতে মেয়েটি গৌর বর্ণের হলেও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার জন্য তার দিকে চোখ রাখা যায় না। ছিপছিপে দোহারা গড়ন। পরনে একটি ভারতীয় ছাপা শাড়ি। হলদেটে কালো ব্লাউজ। শাড়ির আঁচলে বাহু দুটি ঢাকা থাকায় স্বাস্থ্যের দীপ্তিটা চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে। তবে নৌকায় বসার ধরন ও নাওয়ের দুলুনিতে অভ্যস্ত থাকার লক্ষণ সহজেই ধরা পড়ে। তার বিশাল বেণী যেন নদীতে একটা সাপ নেমে যাওয়ার কসরৎ করছে। (*উপমহাদেশ*, পৃ. ১৩)

আল মাহমুদের প্রতিটি রচনায় নারীর উপস্থিতি ঘটেছে সৌন্দর্যের পসরা সাজিয়ে। তাই যুদ্ধকালীন এই কঠিন বাস্তবতার মধ্যেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি নারীদেহের স্বাভাবিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিতে। পুরো উপন্যাসজুড়েই নন্দিনী অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে উপন্যাসে। পালিয়ে যাওয়ার সময় কবি মীর হাদীর সঙ্গে পরিচয় হয় নন্দিনীর। কবি হাদী মীরের লেখা অনেক বইই পড়েছে সে, যদিও সরাসরি কখনো সাক্ষাৎ হয়নি তাদের। হাদী মীরকে এ-কথাই জানায় সে : 'আমি আপনাকে ঠিকই চিনেছিলাম, আপনি কবি সৈয়দ হাদী মীর। আপনার সব বই আমার কাছে আছে, জানেন? আমিও লিখি।' কিন্তু রাজাকার বাহিনী নন্দিনীর ওপর যে পাশবিক নির্যাতন চালিয়েছে তার প্রত্যক্ষদর্শী হওয়ার পরও হাদী মীর নন্দিনীকে কথা দিয়েছে যুদ্ধ চলাকালে কোনো অবস্থাতেই তারা পরস্পরকে ছেড়ে যাবে না। বিবাহিত এবং সুন্দরী স্ত্রী বর্তমান থাকা সত্ত্বেও হাদী মীরের জীবনের সঙ্গে নন্দিনীকে জড়িয়ে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। পরবর্তীকালে দেখা যায় উদ্ভূত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে তারা একে অপরকে স্বামী-স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে নন্দিনীর ওপর এই পাশবিক অত্যাচার দেখেই কি না হাদী মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সেই মুহূর্তে নন্দিনীরও বেঁচে থাকার একটা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিলো। তার আত্মীয়-স্বজন কেউই বেঁচে নেই। একমাত্র হাদী মীরই তার সে-সময়কার অবলম্বন। তাছাড়া রাজাকারদের সঙ্গে হাদী মীরের পৌরুষদীপ্ত আচরণ এবং তাদের রক্ষা করতে গিয়ে নির্যাতিত হওয়া প্রভৃতি বিষয় নন্দিনীকে হাদীর প্রতি আকৃষ্ট করেছে। হাদী মীরের স্ত্রী আছে জেনেও তাই হাদীকে বলেছে নন্দিনী :

> আমার সাথে স্ত্রীর মতোই আচরণ করবে। আমিও স্ত্রীর কাছে প্রাপ্য সবকিছুই তোমাকে দেব। কেন দেব না? আমার আর কী আছে? সতীত্ব কুমারীত্ব কিছুই তো আমার রইল না। এই যুদ্ধে সব লুট হয়ে গেছে। তোমার সামনেই সব ঘটেছে। ... আমি আর আমার পরিণাম নিয়ে চিন্তা করব না। ঈশ্বর যদি মঙ্গলময় হয়ে থাকেন তবে তিনি আমার জন্য মঙ্গলই রাখবেন। (*উপমহাদেশ*, পৃ. ৪৪)

শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হাদী মীর কোন অবস্থাতেই ছেড়ে যায়নি নন্দিনীকে। এমনকি নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে জেনেও নন্দিনীকে নিয়ে আশ্রয় নিয়েছে তার বোনের পরিবারে। বোন ও ভগ্নিপতির কৌতূহলী নানা প্রশ্নের উত্তরে নির্বিঘ্নে সে বলেছে : 'আমি নন্দিনীর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। একে পথে নিঃসঙ্গ ফেলে কোথাও যাবো না।' ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা চিন্তা না করেই হাদী জড়িয়ে গেছে নন্দিনীর জীবনের সঙ্গে। হাদী চাইলে কলকাতায় পৌঁছেই নন্দিনীকে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু সে তা করেনি। নিজের স্ত্রী ফিরে এসে সবকিছু জানলে কী হবে, স্ত্রী বিষয়টিকে কিভাবে নেবে – এ ধরনের ভবিষ্যৎ পরিণামের কথা চিন্তা করেও সে ছেড়ে যেতে পারেনি নন্দিনীকে। স্বল্পকাল ব্যবধানে দৃশ্যপটে আবির্ভাব ঘটে হাদীর স্ত্রী হামিদার। তখন সে একজন মুক্তিযোদ্ধা। ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে মুক্তিযোদ্ধাদের দলে যোগ

দিয়ে দেশরক্ষার ট্রেনিং নিয়েছে। কলকাতায় স্বামীর খোঁজ পেয়ে দেখা করতে এসেছে হামিদা। এসে হাদীর বোনের কাছে নন্দিনী ও হাদীর সম্পর্কের কথা জানতে পেরেও শুধুমাত্র দেশের কথা, স্বাধীনতার কথা চিন্তা করে হামিদা সংযত করেছে তার আবেগকে। স্বামীর পরনারী আসক্তি বা নন্দিনীর প্রতি আকর্ষণের চেয়েও তার কাছে যুদ্ধদিনের বাস্তবতাই গুরুত্বপূর্ণ। তাই যুদ্ধে চলে যাওয়ার পূর্বে হামিদা তার স্বামীকে বলেছে :

> দেখো আমি শুধু তোমার স্ত্রী নই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যোদ্ধা। আমার সামনে হানাদার বাহিনী ছাড়া অন্য কোনো টার্গেট নেই। আমি চাইনা এখন কোনো মানসিক প্রতিদ্বন্দ্বীর ছবি আমার রক্তে মিশে যাক। যাতে দুই শত্রুর মধ্যে দিশেহারা হয়ে আমার নিশানা পড়ে যায়। জয় বাংলা। (*উপমহাদেশ*, পৃ. ৯৮)

যুদ্ধে যাওয়ার পূর্বে স্বামীর কাছে হামিদার প্রত্যাশা ছিল– যুদ্ধশেষে একটিবারের জন্য হলেও হাদী যেন তার খোঁজ নেয়। কারণ স্বামী ছাড়া এ-পৃথিবীতে তার আর কেউ নেই। যুদ্ধশেষে তার একটা অবলম্বন তৈরি না হওয়া পর্যন্ত যেন তাকে ছেড়ে না যায়, নন্দিনীকে বিয়ে করতে চাইলে তার জন্য যেন কিছুদিন অপেক্ষা করে। পরবর্তীকালে বিয়ে করলে তার কোনো আপত্তি নেই। যুদ্ধকালীন এই পরিস্থিতিতে তার স্বামী যে অসহায় একটি নারীর দায়ভার নিয়ে তার সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছে তা সহজভাবেই নিয়েছে হামিদা। যুদ্ধের বর্ণনার মধ্যেও ত্রিভুজ প্রেমের জমজমাট এই প্রেমের কাহিনি একটু ব্যতিক্রমীই বটে। দেখা যায়, যুদ্ধের ঘনঘটাময় এই সময়েও এক রাতের জন্য স্ত্রীকে কাছে পেয়ে জৈবিক আকাঙ্ক্ষায় জেগে উঠে কবি হাদী মীর। হামিদাকে তাই সে বলে :

> তোমার এই মুহূর্তের রূপ, এই গোলাপি শাড়ি আর গাঢ় লাল রংয়ের ব্লাউজ, সোনাদানাহীন নিরলংকার শরীরই তো একজন কবির দেশ। সেই দেশের পক্ষে লিখব বলেই তো আমি প্রতিজ্ঞা করে এখানে এসেছি। অন্তত একটা রাত তোমার উষ্ণতা ও আলিঙ্গনের মধ্যে কাটাতে চাওয়া কী স্বামী হিসেবে আমার অপরাধ? (*উপমহাদেশ*, পৃ. ৯৮)

একমাত্র আল মাহমুদের পক্ষেই সম্ভব জটিল ও রহস্যময় সময়খণ্ডের মধ্যেও উপন্যাসে রোমান্টিক আবহ সঞ্চারিত করা। মুক্তিযুদ্ধের এই সময়ে যেখানে মানুষের মধ্যে থাকবে যুদ্ধংদেহী মনোভাব, বর্ণনার মধ্যে থাকবে যুদ্ধের আবহ-ঘটনার ঘনঘটা, সেখানে তিনি পাঠককে দিয়েছেন রোমান্টিক ভাবানুভূতির আস্বাদ।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কবি হাদী মীর নন্দিনীকে সাথে নিয়ে কলকাতাতেই অবস্থান করেছে। কিন্তু আগরতলা থেকে কলকাতা ফেরার সময় ঘটনাচক্রে তারা একটি টাকার ব্যাগ পায়। প্রাপ্ত টাকার তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে নানা বাধা-বিপত্তি পার হয়ে

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা কাস্টম কলোনীতে যায় নন্দিনী ও হাদী মীর। সেখানে প্রতিমুহূর্তেই ছিলো রাজাকারদের হাতে ধরা পড়ার ভয়। তাছাড়া পাকিস্তানি বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কা তো ছিলই। তথাপি এই ভয়ানক হিমশীতল আবহের মধ্যেও ঔপন্যাসিক হাদী মীর ও নন্দিনী চরিত্রের সম্পর্কের মধ্যে তিনি ধরে রেখেছেন কামজ উত্তাপ। ভয়শীতল এই পরিবেশেও নন্দিনীকে হাদী কামনা করেছে আরও গভীরভাবে। সে সময়কার তাদের কথোপকথন :

> 'তোমার বুকের ওপর একটু হাত রাখব ?'
>
> 'রাখো। ব্লাউজ খুলে দেব?'
>
> 'না থাক। এমনি তোমার বুকে মুখে একটু হাত বুলিয়ে দিতে মন চাইছে। আমরা এখন এমন এক পরিস্থিতিতে চলে এসেছি। আবার যে দেখা সাক্ষাৎ হবে এমন গ্যারান্টি কোথায়?'
>
> 'তাহলে আর অত ভয় কী? আজ রাতটা তোমাকে দিচ্ছি। তোমার যেভাবে খুশি নাও।' (*উপমহাদেশ*, পৃ. ১৩৫)

এতৎসত্ত্বে কবি হাদী মীর দেহসুধাপানে কুণ্ঠিত বোধ করেছে। সে বারবার আকৃষ্ট হয়েছে নন্দিনীর রূপ-যৌবনের মোহে, আবার ফিরে এসেছে নীতি-নৈতিকতার কথা ভেবে। স্ত্রী র্তমান থাকা সত্ত্বেও অন্য নারীকে পরিপূর্ণভাবে কামনা করা যে পাপ, এই ভাবনা বারবার তাকে ফিরিয়ে এনেছে নন্দিনীর কামনাময় কাতর আকাঙ্ক্ষা থেকে। হাদীর ভাবনা : 'মনে হয় এই পাওয়াটা বৈধ বা ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে না। কোথায় একটা সীমাকে লঙ্ঘন করে যাচ্ছি। এদিকে কামনায়, লোভে আমার বুকের পশম পর্যন্ত কাঁপছে। আমিও তো পুরুষ। আমি আর পারছি না।' নন্দিনী বারবার নানাভাবে সুযোগ দেওয়ার পরেও তা গ্রহণ করেনি হাদী। এতে মনঃকষ্টে ভুগেছে নন্দিনী; মনে হয়েছে হাদী তাকে অবহেলা করছে। হয়তো হাদী তার স্ত্রী হামিদাকে ভুলতে পারছে না। এই বোধ থেকে হামিদার প্রতি একধরনের ঈর্ষা বোধ করে নন্দিনী। তাই সে সিদ্ধান্ত নেয়, সেও হামিদার মতো মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়ে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশের ভেতরে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেবে। এই চিন্তা থেকেই নন্দিনী যোগ দেয় কমরেড আলী রেজার নেতৃত্বাধীন গোপন দলের সঙ্গে। মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে কিছুদিন প্রশিক্ষণও নেয়। কিন্তু তার ভাগ্য যেহেতু হাদী মীরের সঙ্গেই বাঁধা, তাই প্রশিক্ষণের মাঝপথে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার সাক্ষী হয়ে প্রশিক্ষণ ও যুদ্ধ বাদ দিয়ে ফিরে আসে হাদী মীরের কাছে। ঔপন্যাসিক *উপমহাদেশ* উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের আবহের চেয়েও নর-নারীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষা তথা ব্যক্তিগত সম্পর্ককেই যে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, তা এসকল ঘটনার মাধ্যমেই তা প্রমাণিত হয়।

মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ঢাকায় এক অপারেশনে গুরুতর আহত হয় হামিদা। খবর পেয়ে হাদী মীর ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয় কমরেড আলী রেজা এবং নন্দিনীকে সঙ্গে নিয়ে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধও ইতোমধ্যে চূড়ান্ত পরিণতির পর্যায়ে, ভারতীয়

সৈন্যবাহিনী প্রবেশ করতে শুরু করেছে বাংলাদেশে। বহু পথ ঘুরে অনেক সময় পেরিয়ে তারা ঢাকায় পৌছে ১৮ ডিসেম্বর। ইতোমধ্যে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কবল থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ; জন্ম নিয়েছে একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র। আনন্দঘন ঠিক এই মুহূর্তেই হাদী মীরের ঢাকার পুরাতন বাসস্থান খিলগাঁওয়ের বাসায় গিয়ে দেখা মেলে মুক্তিযুদ্ধে পঙ্গু হয়ে যাওয়া সাহসী নারী হামিদার। এই প্রথম মুখোমুখি সাক্ষাৎ হামিদা-নন্দিনীর। কিন্তু প্রথম দেখায় দুজনের মধ্যে তৈরি হয়নি কোনো ধরনের উত্তেজনাকর পরিস্থিতির, কোনো ধরনের হিংসা ও ক্রোধের প্রকাশও দেখা যায়নি। মুক্তিযুদ্ধে পঙ্গু হামিদা অতি সহজেই গ্রহণ করেছে নন্দিনীকে এবং মেনে নিয়েছে নন্দিনী-হাদী মীরের সম্পর্ককে। অন্যদিকে নন্দিনীও শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় নিজেকে নিবেদন করেছে হামিদার কর কমলে। নন্দিনীর সঙ্গে হামিদার কথোপকথনে তা-ই পরিস্ফুট হয় :

> আমাকে আর কবিকে ফেলে তুই কোথাও যাস না নন্দিনী। আজ থেকে এ সংসার তোর। আমি পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা, নিরাশ্রয় মানুষ। তোর কবির কোনো কাজে লাগবো না। তবে কবিকে ছেড়ে কোথাও যেতেও পারব না কারণ তোর মতো আমারও এ সংসারে আপন বলতে কেউ নেই। (*উপমহাদেশ*, পৃ. ১৯২)

হামিদা-হাদী মীর–নন্দিনীর মধ্যকার জটিল ও নাটকীয়তাপূর্ণ সম্পর্ককে ঔপন্যাসিক 'অতএব তারা সুখে-শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিলো' গোছের সমাধান দিয়ে দায়িত্ব শেষ করেছেন। উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের নানা কাহিনি–উপকাহিনি ও ঘটনাংশের বিবরণের চেয়েও হাদী মীর-নন্দিনীর মধ্যকার জটিলতাপূর্ণ ও বিচিত্র সম্পর্কের মূল উদঘাটনই যে লেখকের মূল অন্বিষ্ট ছিল তা প্রতীয়মান হয় এ-উপন্যাসে। এখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ তথা সে সময়খণ্ডের বাস্তব জীবনবোধের পরিচয় থাকলেও এতে নর-নারীর সম্পর্ক তথা দেহজ কামনা-বাসনার চিত্রই ফুটে উঠেছে অধিক পরিমাণে। আল মাহমুদের রচনার এ-দিকটি সম্পর্কে একজন সমালোচক বলেন :

> আল মাহমুদ সমকালীন সাহিত্য চিন্তার সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত থেকেই তার স্বকীয়তা বজায় রেখেছেন। তাঁর উপন্যাসগুলোতে ফ্রয়েডের মনোবিকলন তত্ত্বের প্রয়োগ কোথাও প্রবল, আবার কোথাও প্রচ্ছন্ন। তবে সমাজ নিষিদ্ধ যৌন আকর্ষণকে তিনি সামাজিক স্বীকৃতির মাধ্যমে চূড়ান্ত সার্থকতা দিয়েছেন।... নরনারীর প্রেমভাবনার কার্যকারণ-তত্ত্ব, যৌন-ঈর্ষা এবং সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ তার উপন্যাসে অনবদ্যভাবে প্রকাশিত হয়েছে। (ইয়াহ্ইয়া, ২০১৭ : ১১৭)

ছয়.

আল মাহমুদের কথাসাহিত্য তথা উপন্যাস কাহিনিপ্রধান নয়, চরিত্রপ্রধান। চরিত্রকেই উপন্যাসের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে উপস্থাপন করেন তিনি। *উপমহাদেশ* উপন্যাসেও

আমরা দেখি যেন চরিত্রগুলিই নানাদিকে ডালপালা মেলে এগিয়ে নিয়ে গেছে কাহিনিকে। চরিত্রের কর্মক্রিয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অত্যধিক নজর দিতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই যেন কাহিনির কেন্দ্রচ্যুতি ঘটেছে। চরিত্রগুলোর মুখের সংলাপের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রমতা লক্ষণীয় এখানে। তাঁর উপন্যাসের চরিত্রগুলো যেন বেশি কথা বলে। বর্ণনার চেয়ে সংলাপ বেশি। সংলাপের প্রয়োজনে অনেক সময়ই তিনি বেছে নিয়েছেন দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য গার্হস্থ্য ভাষা, গ্রামীণ মানুষের মুখের কথা, এবং অপভাষা। শব্দচয়ন ও ভাষা-ব্যবহারে নতুনত্ব আছে এ-উপন্যাসে। উপন্যাসের শুরুই হয়েছে চমক-জাগানিয়া ভাষায়:

> অন্ধকারে হঠাৎ গুলীর শব্দে নৌকাটা দুলে উঠল। যাত্রীরা উবুড় হয়ে পড়ল এ-ওর গায়ের ওপর। নৌকার পেটের ভেতর থেকে ময়লা পানির ঝাপটা এসে আমার মুখটা সম্পূর্ণ ভিজিয়ে দিল। সার্ট ও গেঞ্জির ভেতর ছলছলানো পানি ঢুকে ঝুলতে লাগল। (*উপমহাদেশ*, পৃ. ৯)

পুরো উপন্যাসেই প্রচুর গ্রামীণ-দেশজ শব্দ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা অলংকারের ব্যবহার করেছেন ঔপন্যাসিক।

উপমহাদেশ উপন্যাসের নামকরণের সঙ্গে উপন্যাসের মূল সুরের সংযোগ স্পষ্ট নয়। পাকিস্তানি ঘাতকদের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি যেভাবে রুখে দাঁড়িয়ে বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জন করেছে স্বাধীনতা ঔপন্যাসিক হয়তোবা এই উপমহাদেশের পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ স্বাধীনতাকামী জাতিকে স্বাধীনতা-অর্জনের জন্য এই ইঙ্গিত করেছেন। এই স্বাধীনতাকামী জাতি উপমহাদেশের নানা অংশে, নানা দেশেই আছে। উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র কমরেড আলী রেজার কথাটি এক্ষেত্রে ইঙ্গিতপূর্ণ :

> আমরা তা হলে আসি কবি সাহেব। পরে কোথাও না কোথাও আপনার সাথে দেখা হয়ে যাবে। ঠিকানা রেখে যেতে পারব না। জানেনই তো আসলে আমাদের কোনো ঠিকানা নেই। আমরা এই বিশাল উপমহাদেশের সর্বত্রই আছি।...আমাদের যুদ্ধটা কার সাথে তা আপনার জানা। (*উপমহাদেশ*, পৃ. ১৯২)

কমরেড আলী রেজার এ-উক্তি মূলত ভারতীয় উপমহাদেশের মাও–লেলিন–মার্কসবাদী বামধারার সকল রাজনৈতিক গোষ্ঠীরই মনের কথা। যারা ভারতীয় উপমহাদেশ তথা সারা বিশ্বেই লড়াই করছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। এই যুদ্ধে জয়ী হয়ে তারা সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চায়। ঔপন্যাসিক তাঁর সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার ধারণা থেকেই হয়তো এ-উপন্যাসের নামকরণ করেছেন *উপমহাদেশ*। কিন্তু এ-উপন্যাসের মূল সুর তা নয়। এ-উপন্যাসের মূল সুর হচ্ছে নবজাগ্রত জাতি ও রাষ্ট্র হিসেবে একটি স্বাধীন-স্বয়ংসম্পূর্ণ বাংলাদেশের উদ্ভব; যা কমরেড আলী রেজাদের শ্রেণিসংগ্রামের যে চেতনা, তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে আশ্রয় করে এ-পর্যন্ত রচিত হয়েছে অসংখ্য সাহিত্য। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক চিত্র তথা আবেদনধর্মী কোন সাহিত্য রচিত হয়নি এখন পর্যন্ত। *উপমহাদেশ*ও এই অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। মুক্তিযুদ্ধকে আশ্রয় করে উপন্যাসটি রচিত হলেও মুক্তিযুদ্ধের সার্বিক চিত্র এতে নেই। ঔপন্যাসিকের ব্যক্তিগত জীবনকেন্দ্রিক এই উপন্যাসে মুক্তিযুদ্ধের আবহ আছে। প্রকৃতপক্ষে হামিদা–হাদী মীর-নন্দিনীর কামনা-বাসনা তথা ত্রিভুজ প্রেমের জটিল রসায়নই এই উপন্যাসের মূল সুর হিসেবে প্রতীয়মান হয়। তাই *উপমহাদেশ*কে মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক উপন্যাস না বলে মুক্তিযুদ্ধাশ্রয়ী আত্মজৈবনিক রোমান্টিক উপন্যাস বলাই বেশি যুক্তিসংগত।

আকরগ্রন্থ

আল মাহমুদ (২০১৩) । *উপমহাদেশ*, অনন্যা, ঢাকা

সহায়কপঞ্জি

গ্রন্থ

আল মাহমুদ (২০১৮)। ভূমিকা, *আল মাহমুদ রচনাবলি*, পঞ্চম খণ্ড, ঐতিহ্য, ঢাকা

গোলাম মুরশিদ (২০১৬)। *মুক্তিযুদ্ধ ও তারপর : একটি নির্দলীয় ইতিহাস*, প্রথমা, ঢাকা

পত্রিকা

আবু রুশদ (২০০৭)। *প্রেক্ষণ*, খন্দকার আবদুল মোমেন সম্পাদিত, আল মাহমুদ সংখ্যা, জুলাই–ডিসেম্বর সংখ্যা ২০০৭

ইয়াহ্ইয়া মান্নান (২০১৭)। 'আল মাহমুদ : কথাসাহিত্যে তাঁর নর-নারীগণ', *নোঙর*, চৌধুরী গোলাম মাওলা সম্পাদিত, আল মাহমুদ সংখ্যা, চট্টগ্রাম, তেইশতম সংখ্যা, মার্চ ২০১৭

ওমর বিশ্বাস (২০০১)। *চাঁড়ুলিয়া*, আল মাহমুদ সংখ্যা, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, জুলাই–সেপ্টেম্বর ২০০১

শিবানন্দ পাল (২০১৯)। 'ব্যক্তি আল মাহমুদ : জীবন ও সাহিত্য', *কারুভাষ*, মানসী কীর্তনীয়া সম্পাদিত, আল মাহমুদ সংখ্যা, কলকাতা, ২০১৯